ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 154-159
www.athenajournalcbm.in

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ও সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের ভারতভাবনা

শুভঙ্কর চ্যাটার্জী*

প্রাপ্ত: ০৫.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ১১.০৫.২০২৪ গৃহীত: ১৭.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গুরুগম্ভীর পরিচয়ের ভারে তাঁর সম্পাদক ভূমিকাটি তুলনামূলকভাবে নেপথ্যে রয়ে যায়। অথচ জীবনের নানান সময়ে অন্ততপক্ষে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছে এবং নিঃসন্দেহে প্রতিটি পর্বই স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার দাবি রাখে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল ঐতিহ্যের স্মারক বঙ্গদর্শন-কে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকাল একটানা পাঁচবছর অতিবাহিত হয় যা অন্য কোনো পত্রিকায় সম্ভব হয়নি। আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১৩১২-এর চৈত্র পর্যন্ত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-কে কেন্দ্র করে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের ভারত সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-সম্পাদনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন ধরনের রচনা বিশেষত প্রবন্ধকে অঙ্গীকার করে পাঠকমনে স্বদেশ তথা ভারত সম্পর্কিত সচেতনতার প্রসার ঘটানো। নিজের দেশ-কে নিবিড়ভাবে চেনা ও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য বিষয়ে সকলকে ওয়াকিবহাল করানোর মহতী পরিকল্পনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-কে যেমন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা নিতে দেখা যায়, তেমনই আবার সমকালের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ও স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনকে ঘিরে জনসাধারণের ইতিকর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই পত্রিকার ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। নিজের মৌলিক রচনা ছাড়াও পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা সেদিন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ পূর্ণ বিকাশের পরিসর পেয়েছিল। ভাবনাগত ক্ষেত্র ধরে সে আলোচনার পাশাপাশি প্রসঙ্গসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাভার গ্রহণের পর্ব ও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনার সাথে তাঁর আদর্শগত পার্থক্যের কথাও এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত।*

সূচক শব্দ: *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন, স্বদেশভাবনা, ঔপনিবেশিকতা, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবাদ।*

*পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: shubhankarchatterjee88@gmail.com

সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছা ও অনিশ্চয়তার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল বঙ্গদর্শন-কে কেন্দ্র ক'রে অথচ এই পত্রিকাতেই তাঁর সম্পাদক জীবনের সর্বাধিক সময় অতিবাহিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র (বৈশাখ ১২৭৯-চৈত্র ১২৮২) ও সঞ্জীবচন্দ্রের (বৈশাখ ১২৮৪-চৈত্র ১২৮৯) হাতফেরতা হয়ে ১২৯০ বঙ্গাব্দে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন-এর চারটি সংখ্যা (কার্তিক-মাঘ) প্রকাশ পাবার পর বন্ধ হয়ে যায়। এককালে বাঙালির জাতীয়-সত্তা নির্মাণের প্রধান সহায়ক পত্রিকাটি তাঁর হাতে অকালে মৃত্যুবরণ করল, এ ক্ষোভ শ্রীশচন্দ্রের অবশ্যই ছিল। দীর্ঘদিনের এই ক্ষোভ পূরণ করবার সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠল যখন শ্রীশচন্দ্রের সহোদর শৈলেশচন্দ্র ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কালিগ্রাম পরগণার নায়েবের দায়িত্ব ত্যাগ ক'রে 'মজুমদার এজেন্সি' নামে একটি পুস্তক প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠা করলেন, পরবর্তীকালে যার নাম হবে 'মজুমদার লাইব্রেরি'। শৈলেশচন্দ্র অগ্রজের পরামর্শ মেনে নিজের এই প্রকাশন সংস্থা থেকেই দীর্ঘদিন নিদ্রাচ্ছন্ন বঙ্গদর্শন-কে পুনরায় জাগ্রত করবার তোড়জোড় শুরু করেন। এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় পরম সুহৃদ প্রিয়নাথ সেনকে সমসময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে, যেখানে বঙ্গদর্শন-এর পুনঃপ্রকাশের সম্ভাবনার পাশাপাশি এরসঙ্গে নিজেকে জড়িত না-রাখার ইঙ্গিতও দিচ্ছেন তিনি। ১৯০১-এর ১৩ই মার্চে কবি বলছেন,— "শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন— সে জন্যে আমাকেও যথেষ্ঠ ঠেলাঠেলি লাগাইয়াছেন। এখন দিবাবসানে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে— এখন কি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে?"[১]

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, এ চিঠি লেখার অল্পসময় আগে রবীন্দ্রনাথ ভারতী-র একবছরের সম্পাদনা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এরমধ্যে আবার একটি পত্রিকার দপ্তর সামলানোর দায়িত্ব নিতে তখন হয়ত তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু শৈলেশ ও শ্রীশচন্দ্র সহজে হাল ছাড়েননি, দুই ভ্রাতা কবিকে ক্রমাগত অনুরোধ-উপরোধ ক'রে যাচ্ছিলেন সম্পাদক পদে আসীন হবার জন্য। যদিও রবীন্দ্রনাথের ১৯০১ সালের মার্চ-এপ্রিলের চিঠিগুলোতে বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদক হবার কোনোরকম ইচ্ছার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়নি। সম্পাদনার কবল থেকে মুক্তি পেতে এইসময় কখনও তিনি প্রিয়নাথ সেনের নাম প্রস্তাব করেছেন শৈলেশচন্দ্রের কাছে, কখনও বন্ধুকে সরাসরি বলেছেন সম্পাদকের পদে বসবার জন্য,— "...আপাততঃ বঙ্গদর্শনের রাজসিংহাসন শূন্য আছে বলেই বোধ হচ্চে— তুমি টপ্ করে চড়ে' বস না।"[২] গোটা এপ্রিল জুড়ে নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন থেকে নিজেকে বিবিক্ত রাখবার চেষ্টা ক'রে গেছেন, কিন্তু নতুন সম্পাদক কে হচ্ছেন, এ রহস্য তখনও মোচন হয়নি। অতঃপর জগদীশচন্দ্রকে লেখা ১০ই মে-এর একটি চিঠিতে পরিষ্কার ক'রে বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের কথা জানা গেল,— "বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে।... কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে।"[৩] যদিও মাধুরীলতার বিবাহের আগেই নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর প্রকাশ তারিখ ১৫ই মে ১৯০১, জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধুরীলতার বিবাহের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন প্রকাশের মধ্যে দিয়ে মাতৃভাষার প্রসারের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সুশিক্ষিত বাঙালির বাংলাভাষার প্রতি আগ্রহ জন্মানো ও জনমানসে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনকে সামনে রেখে সুপরিকল্পিত এক মাধ্যমরূপে সেদিন বঙ্গদর্শন-এর আবির্ভাব। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষা মারফত অধিগত জ্ঞানের ভাণ্ডারকে বাংলা ভাষার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিতে যাতে সমাজের উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির ভেদাভেদ দূরীভূত হয়ে এক পরিবর্তিত সমাজজীবনের আদর্শরূপে পত্রিকাটি স্থাপিত হতে পারে। ১৮৭২-এর মার্চ মাসে শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে লেখা বঙ্কিমের চিঠিতেও বঙ্গদর্শন-এর মধ্যে দিয়ে সুশিক্ষিত ও সাধারণের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানোর কথা বলা হচ্ছে,— "...I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and uneducated classes".[৪] প্রায় একই বয়ান আমরা পাই ১২৭৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' নামক প্রবেশক রচনাটিতেও। সেখানে কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হাতে পত্রিকাটি অর্পণ করার কথা বলা হলেও তা যে আসলে সর্বসাধারণের বাংলা ভাষা-শিক্ষা প্রসারের জন্য নিমিত্ত,

এ কথা বলতে তিনি কসুর করেননি। দেশের আপামরজনের সপক্ষতা করে বঙ্কিম নৈতিকতা অবলম্বন করে বলেন,— "যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না।"[৫] বঙ্কিমের এ সমস্ত বার্তা তাঁর বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দেয়।

কিন্তু ১৩০৮ বঙ্গাব্দে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনাভার গ্রহণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মতো এরকম কোনো স্পষ্ট উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেননি, প্রথম সংখ্যার 'সূচনা' অংশে পত্রিকার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে তাঁর ঘোষনা,— "এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা।"[৬] তবে 'বঙ্গচিত্তের' কোন্ আদর্শ সেসময়ে প্রবলতর রূপে দেখা দিয়েছিল, তার জন্য রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালের পটভূমির ওপর আমাদের খানিক মনোনিবেশ করতে হবে। বস্তুত বঙ্কিমের সময় দেশের জন্য বঙ্গদর্শন-এর যে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গিয়েছিল, তার প্রায় তিরিশবছর পর নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশকালে সে প্রয়োজনের তখন অনেকাংশে প্রশমন ঘটেছে। ইতিমধ্যে শিক্ষার সর্বজনীন প্রসার, দেশে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, ব্যক্তিত্ববোধের স্বাভাবিক পরিণতিসহ একাধিক বিষয় সমাজমানসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিহ্নকে ক্রমশ স্পষ্ট ক'রে তোলে। এখন মহান একজন কেউ সকলের চিন্তা-ভাবনাকে একসূত্রে গেঁথে দেবেন, হয়ে উঠবেন সমাজবদলের মুখ্য কারিগর—এমনটা আশা করা যায় না। এরসঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলের দিকটিও উল্লেখ্যনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজিশিক্ষার দৌলতেই ঔপনিবেশিক শাসনের গলদগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে, ক্রমশ অনাস্থা জমতে শুরু ক'রে একদা মানবতার শিক্ষা দেওয়া ইংরেজ শাসনের ওপর। ইংরেজের উপর আর আস্থা না রেখে আত্মগঠনে উদ্যোগী হয়ে ওঠার সূত্রপাতও ঠিক এইপর্বে। বিবেকানন্দের আত্মাবলম্বনের বাণী তখন যুবমানসে স্বদেশকে নতুনভাবে জানবার শক্তি জোগাচ্ছে, প্রায় সমসময়েই প্রকাশিত উপনিষদের ভাবনাবাহিত পাক্ষিক পত্রিকা উদ্বোধন (১৩০৫)-এর মধ্যে দিয়ে আক্ষরিক অর্থে জাতির স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কিত ধ্যানধারণার উদ্বোধন ঘটছে। আত্মজাগরণের এইসূত্র ধরে জাতীয় জাগরণের প্রসার ঘটে এবং আমাদের পূর্বতন সমাজ, শিক্ষা, ধর্মের প্রতিও নতুন ভাবে অনুরাগের সঞ্চার হয়। রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ জনজাগরণের এই প্রবাহকে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের দ্বারা গৌরবান্বিত করবার প্রয়াস লক্ষ করা গেল।

এই প্রয়াসে মুখ্য কারিগরের ভূমিকা নিয়েছিল পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধগুলি। বস্তুত, আদি বঙ্গদর্শন-এর মতো নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এরও প্রধান সম্পদ ছিল প্রবন্ধ। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালীন অর্থাৎ বৈশাখ ১৩০৮ থেকে চৈত্র ১৩১২ পর্যন্ত এখানে উপন্যাস বেরিয়েছিল দুটি, দুটিরই রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ,—'চোখের বালি' (বৈশাখ ১৩০৮-কার্তিক ১৩০৯) ও 'নৌকাডুবি' (বৈশাখ ১৩১০-আষাঢ় ১৩১২)। এইপর্বে মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয় মোট একুশটি, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা মোটে দুই,—'দর্পহরণ' (ফাল্গুন ১৩০৯) ও 'মাল্যদান' (চৈত্র ১৩০৯), সর্বাধিক গল্প পাওয়া যায় শ্রীশচন্দ্রের-আটটি। যদিও কবিতার ক্ষেত্রে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল, রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য (১৯০১) ও খেয়া (১৯০৬)-র বেশকিছু রচনা এখানে প্রকাশ পায়। কবিদের লম্বা তালিকায় ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রিয়নাথ সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সতীশচন্দ্র রায়, প্রেমানন্দ গুপ্ত এমনকি প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামও মিলছে। তবে সামগ্রিকভাবে এ পর্বের কবিতায় ভাষার লালিত্য, ছন্দের পরিমিতি, সুরের সাম্য প্রভৃতি বিচার করলে সেখানে রবীন্দ্রীয়-গীতিময়তার স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এইসময়ের কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর ব্যবহৃত ভাষা ও ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার এমনই মিল ছিল যে কবির লেখন (১৯২৭) কাব্যে ভুলক্রমে তাঁর কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের নামে পর্যন্ত চলে যায়।[৭]

সুতরাং, নবজাগরণের আলোক প্রভাবিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবনের সে মুহূর্তে 'বঙ্গচিত্তের' প্রধান আদর্শ প্রচারের জন্য প্রবন্ধকেই অঙ্গীকার করলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম বছর থেকেই জাতীয়তাবাদী স্বদেশভাবনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের বার্তা লক্ষ করা গেল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দ জুড়ে একে একে উপস্থিত হতে থাকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' (বৈশাখ), 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' (ফাল্গুন), রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুত্ব' (শ্রাবণ), 'প্রাচীন ভারতের 'একঃ'

(ফাল্গুন), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম' (চৈত্র)-এর মতো প্রবন্ধ। এইসব প্রবন্ধ রিফর্মেশনের যুগে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, ভারতের চিরন্তন ধর্মবোধকে নব্যযুগের সামনে উপস্থিত ক'রে নতুনভাবে আমাদের স্বরূপ উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছে এবং সেইসূত্রে 'স্বদেশ' নামক বিমূর্ত ধারণাটির স্থায়ী রূপরেখা দিতে চেয়েছে ঔপনিষধিক চেতনার সাহায্যে। 'হিন্দুত্ব'-এর তাৎপর্য নির্ণয় ক'রে 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে যেমন বলতে শোনা গেল, হিন্দুত্ব নির্দিষ্ট কোনো ধর্মমতের ওপর নির্ভরশীল নয়, বেদ-এর প্রামাণ্যতায় অবিশ্বাসী সাংখ্যদর্শন প্রণেতাও একজন হিন্দু, আবার 'পঞ্চমকারসাধক ছাগমহিষহননকারী'-ও একজন হিন্দু। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের ভিত্তি ও মেরুদণ্ড হল 'বর্ণাশ্রমধর্ম ও তৎপ্রণোদিনী একনিষ্ঠতা'[৮]। এই একনিষ্ঠতার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রবন্ধগুলিতেও সমানভাবে উপস্থিত। ভারতের মুক্তির পথ, সুদীর্ঘকালের বাহুবন্ধন ছিন্ন করবার পথ, সর্বোপরি ভারতের সফলকাম হবার পথ যে 'একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ'-এর মধ্যে নিহিত,[৯] রবীন্দ্রনাথও এমন মত পোষণ করেছেন। তৎকালে সমগ্র ভারতে নবোত্থিত জাতীয়তাবাদের বিক্ষিপ্ত স্ফূরণকে উপনিষদের দর্শনে অবগাহন করিয়ে তিনি বৃহৎ 'এক'-এর শক্তিতে তাকে সম্বৃত করবার মন্ত্র জোগালেন। উনিশ শতকের এই শেষ পাদে উদ্বোধন পত্রিকায় বিবেকানন্দও উপনিষদের 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' (কঠোপনিষদ ১/৩/১৪) মন্ত্রের দ্বারা পরমুখাপেক্ষী ভারতকে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত ক'রে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনে ধমনিষ্ঠার প্রচারে উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে স্থাপন করলেন, যাবতীয় খণ্ডিত-বিচ্ছিন্নকে একত্রে এনে তাকে পরম একের সমগ্রতায় চাইলেন প্রতিষ্ঠা করতে। কেননা,— "সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই।"[১০] এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এর সঙ্গে রবীন্দ্র সম্পাদনার এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিস্ফুট হয়, বঙ্কিমের সময়ে বঙ্গদর্শন-এ কোমৎ, মিল, স্পেনসারসহ নানান পাশ্চাত্য দার্শনিকের চিন্তাধারার অসপত্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হত, তখন পাশ্চাত্যের জ্ঞানকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করবার দিকে ঝোঁক ছিল প্রবল, রবীন্দ্রনাথে এসে পাশ্চাত্যের সেই প্রভাব অন্তর্হিত হয়ে ঔপনিষধিক প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল মূল চালিকাশক্তি, দেশজ আদর্শের মধ্যেই অন্বেষণ করা হল জাতির উত্তরণের পথ।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের প্রতি নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর উৎসাহ ও উদ্দীপনার আরেক নিদর্শন হল ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল পর্বটি বারংবার স্মরণপূর্বক তার শাশ্বত ভাব ও ভাবনাগুলি বর্তমান কালের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করা। বাল্মীকি, কালিদাস, শূদ্রক প্রমুখের রচনা অবলম্বন ক'রে এসময় বেরতে থাকে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঘুবংশ' (চৈত্র ১৩১১), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ' (বৈশাখ ১৩১২), বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'মৃচ্ছকটিক' (আষাঢ় ১৩১০), নগেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণাধর্মী রচনা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের অঙ্কাঙ্কগত কালবিশ্লেষণ' (চৈত্র ১৩০৯), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'রামায়ণের রচনাকাল' (কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১৩১১ ও জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রঃ ১৩১২)-এর মতো তথ্যধর্মী প্রবন্ধ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের এই লেখাটি বাদ দিলে এইপর্বে রামায়ণ সম্পর্কিত সবচেয়ে বেশি লেখা পাওয়া যায় দীনেশচন্দ্র সেনের। সর্বমোট নয়টি প্রবন্ধে তিনি রামায়ণের তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক গঠন, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের পারস্পরিক তুলনাসহ রাম, সীতা, হনুমান, কৌশল্যার মতো রামায়ণের প্রধান কয়েকটি চরিত্রকে আলাদা আলাদা প্রবন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (পৌষ ১৩০৮) ও 'শকুন্তলা' (আশ্বিন ১৩০৯)-র মতো প্রবন্ধও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হচ্ছে এইসময়ে। প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিজীবন, গার্হস্থ্যজীবন ও সমাজজীবনের সর্বস্তরে ধর্ম ব্যাপারটি কী নিগূঢ় ও প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল, এইসমস্ত প্রবন্ধে তার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি মেলে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সাহিত্যবিচার করতে গিয়ে শিব-পার্বতী ও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার অসম প্রেমের মঙ্গলময় শান্ত পরিণামের নেপথ্যে ধর্মের গাঢ় অস্তিত্বকে মান্যতা দিয়েছেন। উভয়ের মোহগ্রস্ত প্রেম মুনি-ঋষিদের দিকনির্দেশিত ধর্মের গুণেই শাপগ্রস্ত না হয়ে অন্তিমে যে মিলিত হতে পারল, এর কারণ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা,—"ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্তসংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ"।[১১]

বলা বাহুল্য প্রাচীন ভারতে ধর্ম আজকের রিলিজিয়ন (Religion) অর্থের সীমায়িত সংজ্ঞায় আবদ্ধ ছিল না, যে কোনো হিতকর-শুভদায়ক কর্মমাত্রেই তা 'ধর্ম' মেনে করা, সেই কারণেই তা মঙ্গলজনক—এমন ব্যাপ্তঅর্থে তখন ধর্মকে দেখা হত। দীনেশচন্দ্র সেনের রামায়ণের ওপর লেখা প্রবন্ধগুলিতেও প্রসারিত অর্থসমন্বিত এই ধর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। তাই রাম-সীতার নিষ্ঠাময় প্রেম অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেও পরিণামে অধর্মের দ্বারা কলুষিত হয়নি, কারণ ধর্মে তাঁদের প্রগাঢ় বিশ্বাস শেষপর্যন্ত অটুট ছিল। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দাম্পত্যনীতিতে স্থিত থেকে অন্তিমে তাঁদের প্রেমও তাই 'মঙ্গলময় হয়ে উঠিয়াছে' এবং সামাজিক বিধানের পরম ঐক্যের স্বাক্ষর বহন করেছে।[১২] ধর্মকে কেন্দ্রে রেখে প্রাচীন ভারতের নিষ্ঠা ও পবিত্রতার এইসব আদর্শ তুলে ধরে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন আমাদের শিকড়ের চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছে, একইসঙ্গে স্মরণ করাতে চেয়েছে আমাদের জাতীয় পরিচয়ের প্রকৃত স্বরূপটিকে।

পাশাপাশি সমকালীন ভারতবর্ষের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকদৃষ্টি বরাবর জাগরূক ছিল। রাষ্ট্র কী, রাষ্ট্র ও নেশন-এর সঙ্গে পারস্পরিক পার্থক্য কোথায়, ঔপনিবেশিক ভারতে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত— স্বদেশ ও সমাজ সংশ্লিষ্ট এ ধরনের নানা ভাবনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বেশকিছু প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের 'নেশন'-কে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা দেবার মহতী পরিকল্পনায় তখন যেসব পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন তার অন্যতম। 'নেশন কী' (শ্রাবণ ১৩০৮), 'হিন্দুত্ব' (শ্রাবণ ১৩০৮), 'স্বদেশী সমাজ' (ভাদ্র ১৩১১)-এর মতো প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেমন সেইসময় দেশের জাতীয় সত্তা নির্মাণের নিমিত্তে চিন্তাশীল বক্তব্য পেশ করছিলেন, ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আবার রাষ্ট্র ও নেশন-কে 'বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম' রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়ে স্পষ্ট ঘোষনা করলেন,— "বঙ্গদর্শন নবজীবন লাভ করিয়াই এই যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন"।[১৩] ঔপনিবেশিক ভারতে এধরণের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিপ্রশ্ন আরও ব্যাপ্ত আকারে দেখা দিলো ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে, রবীন্দ্র সম্পাদনার শেষ বছরে এসে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ সংঘটিত হয়, তারপরে মাত্র পাঁচমাস বঙ্গদর্শন-এ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা স্বদেশবিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের একাধিক রচনা নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ মুদ্রিত হল। আমরা জানি, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মতানৈক্য ছিল তবুও ১৩১২-র কার্তিক ও অগ্রহায়ণ পরপর দু-মাসে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক বিপিন পালের দুটি প্রবন্ধ বেরোয়। 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' ও 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা' প্রবন্ধদ্বয়ে বঙ্গবিভাগের নেপথ্যে ইংরেজ শাসকদের রাজনৈতিক কূটনীতিকে লক্ষ করেছেন তিনি। বাংলায় ইতিমধ্যে যে সব রাজনৈতিক শক্তি ইংরেজের অটল শাসনের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেই স্বাদেশিক শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করবার কূট অভিপ্রায়ে বঙ্গবিভাগের আয়োজন। ইংরেজের এই বিচ্ছেদনীতির বিরুদ্ধে বিদেশি পণ্য বয়কট নীতি সেদিন দেশজমন্ত্রে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করবার অমোঘ পদক্ষেপ রূপে দেখা দেয়। স্বদেশীদের ইতিকর্তব্য প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্রের তাই নিদান,— "বিদেশীয়-পণ্য-ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গবিভাগনিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।"[১৪]

এইপর্বে রবীন্দ্রনাথও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ তাঁর একাধিক প্রবন্ধে বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র ক'রে স্বদেশ জাগরণের প্রসঙ্গ এনেছেন। বঙ্গবিভাগের আসন্ন ভয়াবহতার মধ্যেও তিনি এর ইতিবাচক দিকটির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন, তাঁর মতে ইংরেজের এই বিচ্ছেদনীতি আমাদের অন্তর্নিহিত 'শক্তি'-র উদ্বোধন ঘটিয়েছে। সেই শক্তির প্রবাহসূত্রে আমাদের ঐক্যানুভূতি আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে পারবে। দেশের যে সারগর্ভ শক্তিকে আমরা এতদিন আত্মবিস্মৃত ছিলাম, এবার বাইরের বিচ্ছেদ তাকে পুনরায় আবিষ্কার করবার নিশ্চিত সুযোগ ক'রে দিলো। এইপর্বে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হবার ঘোষনা বিভিন্নভাবে টের পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিপিনচন্দ্রকে যেমন স্পষ্টত ঋজুভঙ্গিতে এ কথা ব্যক্ত করতে দেখা গেলো, অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আবার বঙ্গভঙ্গের ইতিকথা বিবৃত করলেন গ্রাম্য পাঁচালীর আধারে। কথকতার ছাঁচে ঢালা তাঁর সুবিখ্যাত 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা' নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ বের হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। সেখানে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে বঙ্গবিভাগের দিনটি বঙ্গনারীদের দ্বারা ব্রতপালনের জন্য

তিনি বরাদ্দ করলেন, বঙ্গলক্ষীর সেই ব্রতের লোকায়ত আবেষ্টনীর মধ্যে যদিও স্বদেশীর ধারণা ব্রাত্য রইল না। লোককথার সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থানে লক্ষীর ব্রতকথার অন্দরে বয়কটের বাণী ধ্বনিত হতে লাগল,— "মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো।"[১৫] অর্থাৎ ব্রতকথার আড়ালে এখানে একটু তির্যকভাবে বঙ্গবিচ্ছেদে দেশের সাধারণের ইতিকর্তব্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। ব্রতশেষে সকল ব্রতধারীর উচ্চকিত স্বরে আবৃত্তি শোনা গেলো,— "মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্।"[১৬] আদতে এ ব্রত যে স্বাদেশিক উজ্জীবনের ব্রত, সে কথা বলা বাহুল্য।

ছিন্নপত্রাবলী (১৯৬০)-তে সাধনা (প্রথম প্রকাশ—১৫ই অগ্রঃ ১২৯৮)-র সম্পাদনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,— "...সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো"।[১৭] কিন্তু নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে তাঁর এইরকম প্রত্যক্ষ কোনো মন্তব্য পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া যায় না। সম্পাদনার এইপর্বে কবির ভারতভাবনা উপনিষদের দর্শন ধরে ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড় অন্বেষণে তাঁর সম্পাদনায় একদিকে প্রাচ্য সভ্যতা, হিন্দুত্বের সংজ্ঞা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উপযোগিতার মতো বিষয় যেমন পত্রিকায় ঠাঁই পেয়েছে তেমনি ঔপনিবেশিক ভারতের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গও বিবেচিত হয়েছে সমান গুরুত্বের সঙ্গে। স্বদেশপ্রসঙ্গে যে ঐক্যবদ্ধতার কথা রবীন্দ্রনাথকে বারংবার বলতে দেখা গিয়েছে, অন্য আরেকরকমের ঐক্যবদ্ধতার সূত্র ধরে তিনি পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন বেশকিছু উৎসাহী চিন্তাবিদকে। মুখ্যত তাঁদের সাহচর্যে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রাচীন তপোবনের আদর্শ থেকে উত্তেজনাময় বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত ভারত-নিরীক্ষার সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করে, যার কেন্দ্রে ছিলেন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

সূত্র নির্দেশ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৯২), *চিঠিপত্র-অষ্টম খণ্ড*, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৬০।
২. *তদেব*, পৃ. ১৮১।
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৫৭), *চিঠিপত্র-ষষ্ঠ খণ্ড*, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৪।
৪. Bandyopadhyay, Brajendranath and Das, Sajanikanta, (1940), (Ed.), *Bankimchandra chattopadhyay essays and letters*, Bangiya sahitya samsad, p. 185
৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, (১৩৭১), "বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা", *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৮৪।
৬. "সূচনা", (১৩০৮), *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃ. ৪।
৭. দত্ত, ভবতোষ, (২০০০), *বঙ্গদর্শন পরম্পরা*, বঙ্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র, পৃ. ৪৫।
৮. উপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব, (১৩০৮), "হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১, পৃ. ৯।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩০৯), "ধর্মের সরল আদর্শ", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ১০, পৃ. ৫৩৭।
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩০৮), "প্রাচীন ভারতের 'একঃ'", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১১, পৃ. ৫২৯।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩০৮), "কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ৯, পৃ. ৪৩৩।
১২. সেন, দীনেশচন্দ্র, (১৩১০), "রামায়ণ ও সমাজ", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ১২,পৃ. ৫৮৯।
১৩. ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, (১৩০৮), "রাষ্ট্র ও নেশন", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ৫, পৃ. ২২৮।
১৪. পাল, বিপিনচন্দ্র, (১৩১২), "বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ৫ম বর্ষ, সংখ্যা ৮, পৃ. ৩৫২।
১৫. ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, (১৩১২), "বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা", *নবপর্যায় বঙ্গদর্শন*, ৫ম বর্ষ, সংখ্যা ৯, পৃ. ৪৪৮।
১৬. *তদেব।*
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৯৬০), *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৭৬।